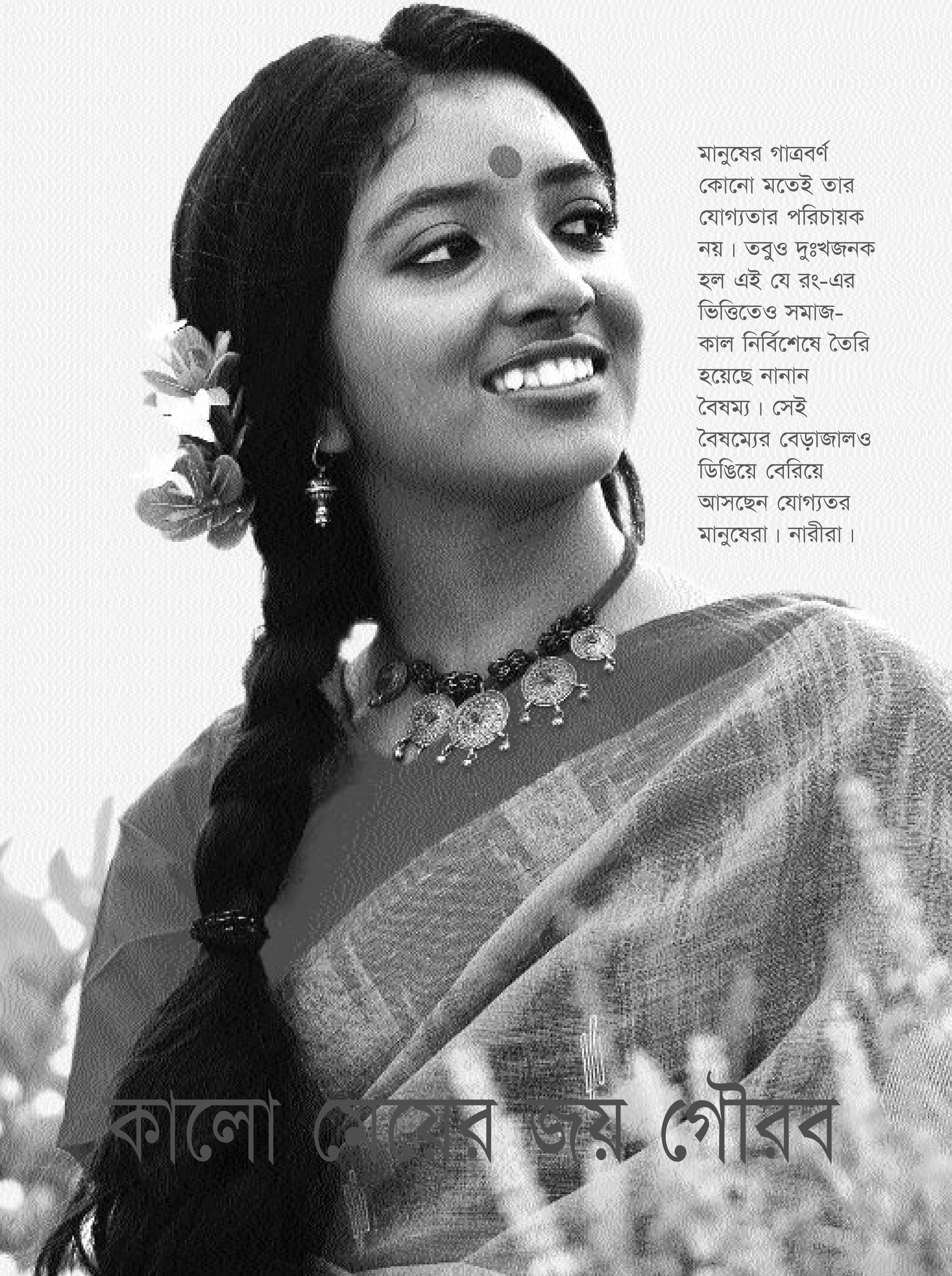

কালো মেয়ের জয় গৌরব

মানুষের গাত্রবর্ণ কোনো মতেই তার যোগ্যতার পরিচায়ক নয়। তবুও দুঃখজনক হল এই যে রং-এর ভিত্তিতেও সমাজ-কাল নির্বিশেষে তৈরি হয়েছে নানান বৈষম্য। সেই বৈষম্যের বেড়াজালও ডিঙিয়ে বেরিয়ে আসছেন যোগ্যতর মানুষেরা। নারীরা।

কেন মেয়ের বেলাতেই বর্ণবাদী?

কালো মেয়ের জন্য যতই কবিতা বা স্তুতিবাক্য উৎসর্গ করা হোক না কেন, তার গাঁয়ের কালো রঙ সমাজে তাকে নানান বিড়ম্বনার মুখোমুখি ফেলবেই। আমাদের সমাজে এখনো কালো এবং ফরসা মেয়ের মধ্যে সুনির্দিষ্ট সীমারেখা টেনে দেওয়া রয়েছে। কালো মেয়েকে অনেকে শুধু কালো নয়, ‘রঙ ময়লা’ বলেও আখ্যায়িত করেন। অর্থাৎ ‘ময়লা’ কথাটি ‘কালোর’ সমার্থক শব্দ হিসেবে এখানে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও কালো মেয়েকে এক ধরনের হীনম্মন্যতায় ভোগার জন্য ছোটবেলা থেকেই একটা ক্ষেত্র তৈরি করে দেওয়া হয়, সেখানে পরিবার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ফরসা রঙের মেয়েকে যেখানে ‘সুন্দরী’ উপাধি দেওয়া হচ্ছে সহজেই, সেখানে কালো মেয়েকে শিখিয়ে দেওয়া হয় রং ফর্সা করার প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম পন্থাগুলোর ব্যবহারের পদ্ধতি। যেন গায়ের রঙ ফর্সা তথা পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত সে একজন অপরিষ্কার নোংরা মানুষ। সংসারে বাবা-মা বা আত্মীয় স্বজনরাই তার মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেন এক দুঃশ্চিন্তার বীজ। ‘আমার মেয়ের গায়ের রঙটা একটু চাপা’- এ ধরনের কথা কালো মেয়েদের একটা ‘চাপের’ মধ্যেই ফেলে দেয়। স্বাভাবিকভাবেই বিয়ের বাজারে শ্বশুরবাড়ির লোকজন সাদা রঙয়ের নাক বোঁচা-চোখ ছোট- ঠোঁট মোটা-গাল উঁচু মেয়েকে অনায়াসে সুন্দরী বলেন শুধুমাত্র-তার গায়ের রং ফরসা হবার প্রেক্ষিত্রে। কথাটা অযৌক্তিক শোনালেও ‘ইহাই বাস্তব।’ অগ্রসর মন-মানসিকতার লোকজন হয়তো-এর ঘোরতর বিরোধিতা করবেন। কিন্তু অজপাড়া গাঁ থেকে শুরু করে উচ্চবিত্ত পরিবারে খোঁজ নিয়ে দেখলে-এর কোনও ব্যতিক্রম চোখে পড়বে না। গ্রামের সহজ সরল বালিকার ঘরেও রঙ ফর্সাকারী কোনও একটি ক্রীম থাকবে, যা কিনা উচ্চশিক্ষিত বড় চাকরিজীবী মেয়েটির হাত ব্যাগেও রয়েছে। গায়ের কালো রঙ ফরসা করার জন্য নিত্যদিনের সংগ্রামের সাথী যেন এটি। সেই সাথে তো রয়েছে হলুদ বাটা, চন্দন বাটাসহ নানান মশলাপাতির ব্যবহার। লক্ষ্য একটাই– গায়ের রঙ সাফ করা। কালো রঙ নিয়ে এ বিড়ম্বনার চিত্র দেখেই হয়তো তারাশঙ্কর গান বেঁধেছিলেন– ‘কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কান্দো ক্যানে?’– কিন্তু লেখক সান্ত্বনাবাণীতে কিইবা আসে যায়! এতে কালো মেয়ের মন ভালো হয় না। কারণ ঘরে-বাইরে, সংসার- অফিস আদালতে, কর্মক্ষেত্রে সব জায়গায় কালো মেয়েদের গাঁয়ের রঙটি কি কোনও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে না? তাকে কি এক ধরনের অসুস্থ মানসিকতার বলয়ে আবৃত করে ফেলে না? যখন শিক্ষিত একজন মেয়ে গায়ের কালো রঙয়ের জন্য নিজেকে বাবা-মা’র বোঝা ভাবে এবং পরক্ষণেই লোক ঠকানো বিপজ্জনক মার্কা পণ্যের ফেয়ার এন্ড লাভলী ব্যবহারে রং ফরসা হওয়ার প্রলোভনের ফাঁদে

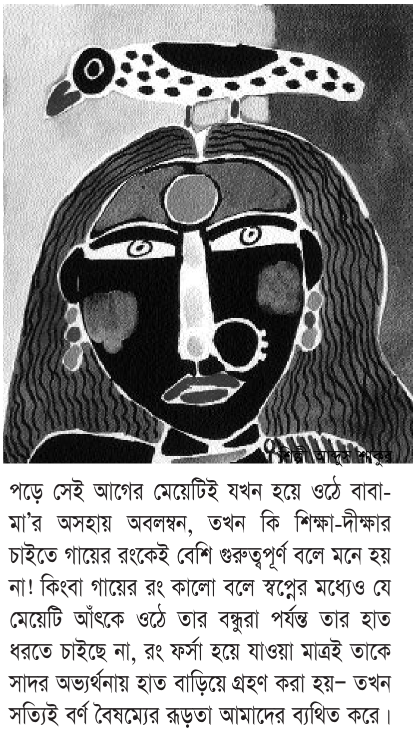

পড়ে সেই আগের মেয়েটিই যখন হয়ে ওঠে বাবা-মা’র অসহায় অবলম্বন, তখন কি শিক্ষা-দীক্ষার চাইতে গায়ের রংকেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় না! কিংবা গায়ের রং কালো বলে স্বপ্নের মধ্যেও যে মেয়েটি আঁৎকে ওঠে তার বন্ধুরা পর্যন্ত তার হাত ধরতে চাইছে না, রং ফর্সা হয়ে যাওয়া মাত্রই তাকে সাদর অভ্যর্থনায় হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করা হয়– তখন সত্যিই বর্ণ বৈষম্যের রূঢ়তা আমাদের ব্যথিত করে। আজকের এই প্রতিযোগিতামূলক পৃথিবীতে যখন মেয়েরা সমঅধিকার তথা মানুষের অধিকার নিয়ে বাঁচার লড়াইয়ে ব্যস্ত, তখন গায়ের কালো রং আর ফর্সা রং-এর লড়াই শুধুই আমাদের অগ্রসরতাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখায়। ঘরে এবং ঘরের বাইরে একজন মেয়ের যোগ্যতার বিচার হবে তার মেধা, মনন, সৃষ্টিশীলতা, দক্ষতা, স্মার্টনেস সবকিছু মিলিয়েই। সেখানে গায়ের রঙও যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হতে পারে তা ভাবতেও দুঃখ হয়। আর কালো-মেয়েদের দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত সময়গুলোর মধ্যে প্রাক-বিবাহ এবং বিবাহোত্তর সময় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একজন উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েকেও বিয়ের পর শাশুড়ি বা ননদের কথা শুনতে হয়েছে তার গায়ের কালো রঙ নিয়ে। মেয়েটির গর্ভের শিশুটির গায়ের রঙ-ও মা’র মতো কালো হবে কিনা এ ব্যাপারে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত ননদেরা ভাবীকে অপদস্থ্য করার সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করেনি। আর নিম্ন বা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে তো কালো মেয়ের বিয়েতে শ্বশুরবাড়িকে মন ভরিয়ে দিতে হবে উপঢোকন দিয়ে, যাতে করে কখনোই মেয়েটিকে নানান ছুঁতো ধরে পর্যুদস্ত হতে না হয়। যদিও গায়ের রঙকে তুচ্ছ প্রতিপন্ন করে নানান শ্লোকই প্রচলিত রয়েছে আমাদের সমাজে যেমন, ‘জাতের মেয়ে কালোও ভালো, নদীর পানি ঘোলাও ভালো’ অথবা ‘কালোই জগতের আলো’– কিন্তু এতে বিন্দুমাত্র দূরীভূত হয়নি কালো মেয়েদের প্রতি বৈষম্যতা। যদিও আজকের শিক্ষিত মেয়েরা অনেকেই ঝেড়ে ফেলে দিয়েছেন কালো ফর্সার দ্বন্দ্বকে, তারা নিজেদের যোগ্যতা দিয়েই জয় করছেন পৃথিবীকে, তারপরও সমাজ থেকে এখনো দূর হয়নি ফরসা রঙয়ের প্রতি পক্ষপাতিত্বের মনোবৃত্তি। এখনো ফরসা মেয়ে হলে বাবা-মা অধিকন্তর খুশী হন, খুশী হন স্বামী এবং শুশুরবাড়ী, নিশ্চিন্তবোধ করেন মেয়ে নিজেও। বন্ধু বান্ধব, সহপাঠী বা সহকর্মীরাও একটু অন্য নজরে দেখেন। কালো মেয়ের মনে তখন স্বাভাবিকভাবেই একটা ‘ইনফিওরিটি কমপ্লেক্স’ দানা বাঁধে। ফরসা হবার জন্য মনে থাকে এক অদম্য বাসনা। নিজের গয়ের কালো রং মানসিকভাবে তাকে দুর্বল করে রাখে, এটা কারোই কাম্য হওয়া উচিত নয়। বরং আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা কালো-ফরসার উর্ধ্বে উঠে যোগ্যতার মানদণ্ডে যাচাই করিনা কেন সবাইকে! ‘সবারে বাসিবে ভালো-নইলে মনের কালো ঘুচবে নারে’-সেই অমৃত বাণীকে মনে রেখে কেনই ঘুচিয়ে ফেলিনা কালো-ফরসার দ্বন্দ্ব! প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে রং-চং নয় বরং সার্বিক যোগ্যতায় যোগ্য হয়েই মেয়েরা টিকে থাকবে, এগিয়ে থাকবে জীবনের প্রতিটি ধাপে, এসব বার্তা নিয়েই প্রচারণা শুরু হোক। মেয়েদের বেশি বেশি করে জানানো হোক, রঙ ফরসা করা নয়, বরং কিভাবে নিজের সুপ্ত প্রতিভা আর ক্ষমতাকে মেলে ধরতে হবে সবার কাছে, যা তাকে এনে দেবে সম্মান আর নিশ্চয়তা। মেয়ে কালো কিংবা ফরসা নয়, মেয়ে যোগ্য– এটাই যেন হয় তার পরিচয়। ● কাশফিয়া আহমেদ

> কালো মেয়েদের দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত সময়গুলোর মধ্যে প্রাক-বিবাহ এবং বিবাহোত্তর সময় উল্লেখযোগ্য। মেয়েটির গর্ভের শিশুটির গায়ের রঙ-ও কালো হবে কিনা এ ব্যাপারে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত ননদেরা অপদস্থ করার সুযোগ হাতছাড়া করে না

> গ্রামের সহজ সরল বালিকার ঘরেও রঙ ফর্সাকারী কোনও একটি ক্রীম থাকবে, যা কিনা উচ্চশিক্ষিত বড় চাকরিজীবী মেয়েটির হাত ব্যাগেও রয়েছে। গায়ের কালো রঙ ফরসার করার জন্য নিত্যদিনের সংগ্রামের সাথী যেন এটি

চিন্তা আর কাজ নয় রং নয় সাজ

গায়ের রঙ-এর কারণে যখন শারীরিক, মানসিক, রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে অত্যাচার করা হয় তখন তা বর্ণবাদী হয়ে যায়।

আফ্রিকা মহাদেশের পাতায় চোখ বুলালে দেখা যায় শেতাঙ্গদের বর্ণবিদ্বেষের কথা। এখান থেকে তারা কৃষ্ণাঙ্গদের পশুর মতো ধরে জাহাজে করে নিয়ে গিয়ে দাস বানিয়ে রাখতো। দাস প্রথা তখন থেকে চালু হয়েছিল। চলতো তাদের উপর অমানবিক অত্যাচার। কালো নারীরা পরিণত হতো ভোগ্যপণ্যে। তাদের রাষ্ট্রীয় কোনও সুযোগ সুবিধা দেয়া হোত না। ভোটেরও কোনও অধিকার তাদের ছিল না। এব্রাহাম লিঙ্কন কালোদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করলেও মুক্তি দেয়নি বর্ণবিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গ সমাজ।

কালোদেরকে দাবিয়ে রাখা এবং অত্যাচার চালিয়ে যাওয়ার জন্য শ্বেতাঙ্গরা 'Klu Klux Klan' নামের একটি ঘৃণ সংগঠন তৈরি করে। হিটলারের মতো করেই তারা নিজেদের বিশ্বের সেরা এবং প্রধান করতো। যা এখনও বহাল আছে।

পরে আফ্রিকায় তারা লাট হয়ে শাসন শুরু করে। তাদের বর্ণবিদেষী শাসনের ফলে কৃষ্ণাঙ্গরা হয়ে পড়ে নিগৃহীত। নিজ দেশেই পরবাসীর মতোই বাস করতে হোত। নেলসন ম্যান্ডেলার বর্ণ বৈষম্যনীতির বিরুদ্ধে দীর্ঘ আন্দোলনে ফিরে আসে কৃষ্ণাঙ্গদের সম্মান এবং মুক্তির অধিকার। আজ-কৃষ্ণাঙ্গ শেতাঙ্গ বলে কোন কথা নেই সেখানে। সব বর্ণের মানুষই সমান।

সারা বিশ্বে বর্ণবৈষম্য নীতি পাল্টে গেছে। আজ খোদ আমেরিকার পার্লামেন্ট, জাতিসংঘসহ অন্যান্য বড়পদগুলোতেও কালোদের স্থান। শুধু তাই নয় ,বিশ্ব সুন্দরী জয়ের মুকুটও আজ শোভা পায় কৃষ্ণাঙ্গদের মাথায়। মডেলিং, টিভি এ্যাংকারও জয় করে নিয়েছে কৃষ্ণাঙ্গরা। তারা প্রমাণ করেছে সুন্দর বলতে শুধু গায়ের সাদা চামড়া নয়, বরং মেধা, চারিত্রিক গুণাবলী এবং দৃঢ় মনোবলই পারে একজন মানুষকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে, এনে দিতে পারে যশ, খ্যাতি। করতে পারে বিশ্ব নন্দিত। যা প্রমাণ করেছে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা, তার সাবেক স্ত্রী উইনি ম্যান্ডেলা, মডেল নওমি ক্যাম্পবেল, টিভিএ্যাংকর ওপরা, কন্ডেলিজা রাইস-এর মতো কালো মানুষেরা।

> বহির্বিশ্ব ছেড়ে নিজের দেশেই দেখি না কেন যেখানে গায়ের রঙ নয় বরং মেধা এবং দৃঢ় চারিত্রিক মনোবল তাদের সাফল্য এবং খ্যাতি এনে দিয়েছে

উইনি ম্যান্ডেলা জড়িয়ে আছেন নেলসন ম্যান্ডেলার দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নীতি আন্দোলনের সাথে। দক্ষিণ আফ্রিকাতে বর্ণবৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরালো করতে তিনি নারীদেরকে উৎসাহ দিতেন শক্তভাবে উঠে দাঁড়াতে। আন্দোলন করতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে তিনি জেল খেটেছেন, অত্যাচারিত হয়েছেন কিন্তু মনোবল হারাননি, হয়ে পড়েননি দুর্বল। সবসময় সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে থেকেছেন। তার পরিশ্রম নিষ্ঠা তাকে করেছে বিতর্কিত যা অবজ্ঞা করার সাধ্য কারোর নেই। দক্ষিণ আফ্রিকানদের হৃদয়ের রাণী তিনি। ভালবেসে নাম দিয়েছে 'জাতির জননী।'

শুধু নেলসন ম্যান্ডেলার স্ত্রী হিসেবে পরিচিত নন, তিনি-এ এন সি উইমেন্সলীগেরও প্রধান।

অন্যদিকে ফ্যাশন জগতে কোনো মডেলের নাম মনে পড়লে চোখে ভেসে ওঠে লম্বা, ছিপছিপে গড়নের কালো মেয়েটির ছবি। এ আর কেউ নয় ২৭ বছর বয়সী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মডেল নওমি ক্যাম্পবেল, পরিশীলিত এবং আবেদনময়ী স্বভাবের এই মেয়েটি মডেলিং এবং নামকরা পত্রিকার কভারগুলোতে বহ্নিমান। তার মেধা, নিষ্ঠা নিজেকে উপস্থাপন করার দক্ষতা তাকে করেছে আন্তর্জাতিক সেলিব্রেটি। তিনি প্রমাণ করেছেন সুশিক্ষিত সংস্কৃতিসম্পন্ন মানসিকতা, মেধা এবং চারিত্রিক গুণাবলী পারে মানুষকে সুন্দর করতে। তিনি শুধু মডেলিং-এ নয়, সমাজ সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন।

ওপরা উইনফ্রে নামের কালো মেয়েটি আজ টিভিএ্যাংকর নামে সারা বিশ্বে জনপ্রিয়। বিশেষ একটি উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি প্রোগ্রাম উপস্থাপন করছেন। বিভিন্নক্ষেত্রে নারীরা অপব্যবহৃত, নিপীড়িত, নির্যাতিত এবং অবাঞ্চিত, তাদের তুলে আনেন। তার সংস্পর্শে এসে তারা ভুলে যায় তাদের গ্লানি।

খেলার জগতের দিকে তাকালে দেখা যায়, ভেনাস উইলিয়াম, সেরোনা উইলিয়াম তাদের টেনিসে আজ বিশ্ব খ্যাত। যেখানে সৌন্দর্য খুবই তুচ্ছ।

বহির্বিশ্ব ছেড়ে নিজের দেশেই দেখি না কেন যেখানে গায়ের রঙ নয় বরং মেধা এবং দৃঢ় চারিত্রিক মনোবল তাদের খ্যাতি এনে দিয়েছে। তাদেরই একজন বিবি রাসেল, বাংলাদেশের প্রথম নারী যিনি লন্ডনে এক আন্তর্জাতিক ফ্যাশন শো'তে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া তার ডিজাইনকৃত পোশাকও সমাদৃত বিশ্বে। তাহলে কোনটাকে আমরা প্রাধান্য দেবো ফরসা কালো না মেধা? ● ফৌজিয়া হক রিমি

গায়ের রং ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি উইনি ম্যান্ডেলা, ওপরা উইনফ্রে, সেরেনা উইলিয়ামস আর বিবি রাসেলদের অগ্রযাত্রাকে